বছরে দু'দুটো একুশে

আলমগীর সাত্তার

দুটো একুশের প্রথম হলো একুশে ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয়টা সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একুশে আগস্ট। প্রথমটা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' আর দ্বিতীয়টা 'আমার ভাই ও বোনের রক্তে রাঙানো'।

প্রথম একুশে আমাদের ইতিহাস এবং জাতীয় জীবন কতোটা প্রভাবিত করেছে তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনও প্রথম একুশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐ দিনটা এখন শুধু আমাদের ভাষা দিবসই নয়, আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসও বটে। দ্বিতীয় একুশের প্রভাব কতোটা সুদূরপ্রসারী হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে সম্ভবত আমাদের ইতিহাসকে বেশ প্রভাবিত করবে। মনে হয় প্রথম একুশে ভাষা দিবস এবং দ্বিতীয় একুশে গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হবে।

অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশ্য যদি মানুষের মনোবল ঠিক থাকে, যদি তা ভেঙে না পড়ে। একাত্তরের ২৬ মার্চের পর পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অমন প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। কারণ মানুষের মনোবল ঠিক ছিল। এবারের ২১ আগস্টের পরেও দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলসমূহের মনোবল ঠিক আছে। তাই প্রতিরোধ গড়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা আছে।

আমাদের উপমহাদেশীয় দেশগুলোর মধ্যে কেবল আমরাই যুদ্ধ করে অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অন্যরা পেয়েছে ফেলে যাওয়া, বিলিয়ে দেয়া, কুড়িয়ে পাওয়া স্বাধীনতা। তাই আমাদের স্বাধীনতার মূল্য একটু বেশি। মৌলবাদীদের দাপটে আমরা ঐ স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে পারি না।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে নিয়ামকের ভূমিকায় ছিল এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রচন্ড ত্যাগ স্বীকার, শেখ মুজিবের অতুলনীয় নেতৃত্ব, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী ভূমিকা, ইন্দিরা গান্ধীর বিচক্ষণতা, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন ইত্যাদি। এছাড়া পাকবাহিনীর সীমাহীন নিষ্ঠুরতা এবং হেনরি কিসিঞ্জারের চীন সফর- এ দুটো কারণও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করেছে।

পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচার সমস্ত বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঠেলে দিয়েছিল এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সে সম্পর্কে দু-একটা উদাহরণ দেবো, তারপর কিসিঞ্জারের চীন সফর, প্রসঙ্গে কথা বলবো।

একাত্তরের ৯ মে আমি ঢাকা থেকে আগরতলার পথে রওয়ানা করলাম। উদ্দেশ্য অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা। মহাখালী কলেরা রিসার্চ সেন্টারের ডাক্তার মি. রায়কে সঙ্গী হিসেবে পেলাম। সন্ধ্যাবেলায় কুমিল্লার চান্দিনা হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে হাতিমারা নামের ভারতীয় বর্ডার পোস্টে পৌঁছে রাতটা সেখানেই কাটালাম।

১০ মে সকালবেলায় আবার আগরতলার দিকে যাত্রা শুরু করলাম। ডাক্তার রায় এবং আমি হাতিমারা বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। ঐ সময় আমাদের পাশে পাশে অনেক লোক হেঁটে যাচ্ছিল। এরকমভাবে যেতে যেতেই বেশ বয়স্ক একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। সঙ্গে ছিল তারই পনেরো-ষোলো বছর বয়সী পুত্র।

বয়স্ক লোকটি জানালেন তার বাড়ি চাঁদপুর। তিনি একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। কোনো রকমের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু পাকবাহিনী তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। হত্যা করেছে তার বড় ছেলেকে। তাই তিনি বড় ছেলের হত্যা এবং বাড়িঘর পোড়ানোর প্রতিশোধ নিতে চান। এই বয়সে নিজে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারবেন না বলে স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, যাতে সে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। কোনো পিতা নিজের ছেলেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ভর্তি করিয়ে দেয়ার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন- এমন ঘটনা এই প্রথম আমার গোচরে এলো।

স্কুলশিক্ষক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম, পাকিস্তান আর্মির অত্যাচারের মাত্রা যতো বাড়বে, মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাও ততোই বাড়বে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বউ ছেলে-মেয়েসহ ছিল বরিশালের স্বরূপকাঠি উপজেলার সুটিয়াকাঠি গ্রামে। যুদ্ধে যাবার আগে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ছোটবেলার কয়েকজন বন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য আমার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হলাম। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কোলকাতার বাংলাদেশ সরকারের হেডকোয়ার্টার থিয়েটার রোডে গিয়ে স্বরূপকাঠি অঞ্চলের বেশ কয়েকজন পরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের কাছে জানতে পারলাম, স্বরূপকাঠির প্রধান বাজার

আমাদের উপমহাদেশীয় দেশগুলোর মধ্যে কেবল আমরাই যুদ্ধ করে অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অন্যরা পেয়েছে ফেলে যাওয়া, বিলিয়ে দেয়া, কুড়িয়ে পাওয়া স্বাধীনতা। তাই আমাদের স্বাধীনতার মূল্য একটু বেশি। মৌলবাদীদের দাপটে আমরা ঐ স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে পারি না

ইন্দুরহাট বন্দরে পাকবাহিনী আক্রমণ করে অনেক দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং নির্বিচারে গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে। তাই ঐ অঞ্চলের ছেলেরা বাঁচার তাগিদে এবং প্রতিশোধস্পৃহায় দলে দলে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। পাকবাহিনী ইন্দুরহাট বন্দরে আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে লোকজনকে হত্যা না করলে এরা কেউই মুক্তিযোদ্ধা হতো না।

২১ আগস্টের হত্যাকান্ড মানুষকে বর্তমানে দেশে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য করছে এবং বিরোধী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে।

এবারে কিসিঞ্জারের চীন সফর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে কতোটা সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

আমেরিকা, চীনসহ মধ্যপ্রাচ্যের সব মুসলিম দেশের সমর্থন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। এমন অবস্থায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ছিল। ভারত সরকারের সংশয় ছিল তারা কি এককভাবে সব সামাল দিতে পারবে? এর ফলে ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিচ্ছিল এবং অস্ত্র সরবরাহ করছিল খুবই সীমিত আকারে।

একাত্তরের সময়কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল আমেরিকার সমকক্ষ শক্তিধর দেশ। ভারত সরকার এজন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিঃশর্ত সমর্থন লাভের চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু তেমন প্রতিশ্রুতি পাচ্ছিল না।

বিরাট ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার পর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের চরিত্র কেমন হবে? শ্রেণীস্বার্থের ব্যাপারে সে সরকারের অবস্থান কি হবে? এমন হাজারো প্রশ্ন ছিল সোভিয়েট নেতাদের মনে। এসব প্রশ্নসহ আরো অনেক কিছুর ব্যাপারে সোভিয়েট নেতারা স্পষ্ট ধারণা লাভের অপেক্ষায় ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করছিল।

একাত্তরের সময়কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল প্রচন্ড রকমের শত্রুতাপূর্ণ। জুলাই মাসে কিসিঞ্জার সাহেব ভারতে এসে ঐ দেশের সরকারকে বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে পাকিস্তান রওয়ানা করলেন। এরপর ওখান থেকে গোপনে গেলেন চীন সফরে। এর আগে মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খান চীন সফরে গিয়েছিলেন। সবকিছু দেখে সোভিয়েট নেতাদের টনক নড়ে। ঐ দেশের নেতারা দেখলেন আমেরিকা, চীন, পাকিস্তান, ন্যাটো জোটের দেশসমূহ তাদের দেশটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এরা সবাই শত্রুভাবাপন্ন। শত্রুর এই ব্যূহকে ভাঙতে হবে। ঐ অবস্থায় ভারতকে মিত্র দেশ হিসেবে পাবার জন্য সোভিয়েট নেতারা যে কোনো মূল্য দিতে রাজি হয়ে গেল। ভারত তো আগে থেকেই এমনটা চাচ্ছিল। সোভিয়েটের সঙ্গে ভারত এর আগেও একটা মৈত্রী চুক্তি করার চেষ্টা চালিয়েছিল। সেটা তখন সফল হয়নি। এবার দু'পক্ষের প্রবল ইচ্ছার কারণে অতি দ্রুততার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

ঐ চুক্তির একটি ধারায় উল্লেখ ছিল, দুটি দেশের যে কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। চুক্তির এই ধারা কিসিঞ্জার-চৌ এনলাই-ইয়াহিয়া খানকে একেবারে হতোদ্যম করে ফেললো।

সোভিয়েট শ্বেতভল্লুক তখন এমনই শক্তিশালী ছিল যে, এক থাবায় চীনের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখতো। আর চীনারা এ খবর অন্যদের চেয়ে ভালো জানতো। তাই একাত্তরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখেছি, জাতিসংঘে চৈনিক প্রতিনিধি শুধু ঘেউ ঘেউ করেছে। কিন্তু চীনারা এর বেশি কিছু করতে অর্থাৎ পাকিস্তানকে সাহায্য করতে একটুও এগিয়ে আসেনি বা এগিয়ে আসতে সাহস করেনি।

আমেরিকা ও চীনের মধ্যে দূতিয়ালি করার কারণে সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানের ওপরও মহাখেপা খেপেছিল। তাই পাকিস্তানকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতির সবুজ সংকেত দিয়েছিল ভার-তকে।

মৈত্রী চুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে ভারতের চীনা-ভীতি দূর হলো। এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের ব্যাপারেও আর কৃপণতা রইলো না। ডিসেম্বরে সর্বাত্মক যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথবাহিনী পাকিস্তানিদের বিষদাঁত ভেঙে দিল।

২১ আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ড মৌলবাদীদের বিষদাঁত ভাঙার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিসহ বাংলার আপামর জনসাধারণকে একত্রিত করবে এমনটিই আমার ধারণা। বিএনপি জোট টিকিয়ে রাখার নামে মৌলবাদীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে জনসমর্থন হারিয়ে জামায়াতে ইসলামীর বি-টিমে পর্যবসিত হবে। মনে রাখতে হবে, ২১ আগস্টের ঘটনা ভোটপ্রাপ্তির অঙ্কের হিসাব, সমীকরণ, ইকুয়েশন সব উল্টেপাল্টে দিয়েছে।

একাত্তরের ২৫ মার্চের ঘটনায় আমি খুব শক্‌ড হয়েছিলাম। সেটা শুধু প্রাথমিকভাবে। পরিশেষে আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভই করেছিলাম।

২১ আগস্টেও ২৫ মার্চের রাতের ঘটনার মতোই শক্‌ড হয়েছি। দেখা যাক কি হয়!

এই লেখায় কিসিঞ্জারের কথা উল্লেখ করেছি, কারণ জোট সরকারে কিসিঞ্জারের মতো কয়েকজন কূটবুদ্ধির মানুষ আছেন। '৭১ সালে কিসিঞ্জারের কূটবুদ্ধির চালগুলো বুমেরাং হয়ে আমাদের জন্য আশীর্বাদ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। জোট সরকারের মধ্যকার কিসিঞ্জারদের কূটবুদ্ধি এবার বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে যথেষ্টই।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের স্বপ্ন এখন হাতের মুঠোয়...

*অন্য অনেক রকম সংকটের পাশাপাশি বাংলাদেশে এখন শিক্ষা সংকটও প্রকট। প্রথমত, এখানে শিক্ষা ব্যয় অনেকটা অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন, যা শুধু উচ্চবিত্তদের পক্ষেই বহন করা সম্ভব। তদুপরি বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করেও মানসম্পন্ন উপযুক্ত শিক্ষার কোনো নিশ্চয়তা নেই দেশে। এখানকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে গেলে কোনো কাজেই লাগে না এবং দেশেও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন নেই। অথচ বাংলাদেশের যে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক কম খরচে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়ায়। দেশ দুটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর এশিয়ার যে কোনো উন্নত দেশে তো বটেই, এমনকি ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলোতেও কর্মসংস্থানের দুয়ার অবারিত হয়ে যায়। এছাড়া মালয়েশিয়া ও ফিলিপিন্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা রয়েছে। অথচ এই দু'দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকমের কম। মেরিন, অ্যারোনটিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়ার প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে। বাংলাদেশে 'আইসি এন এডু' নামের একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ মালয়েশিয়া ও ফিলিপিন্সের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়ে লিয়াজোঁ করে থাকে। **হাতিরপুলে ইস্টার্ন প্লাজার অষ্টম তলায়** (রুম নং-২৮, ফোন : ৯৬৬৭৩৫০, ৮৬১৭১১৪, ফ্যাক্স : ৯৬৭৩৬৮৯, মোবাইল : ০১৯৪৯০৪১৫ ও ০১৭২২৮৬০২৭) তাদের অফিস। প্রতিষ্ঠানটি একই সঙ্গে যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, তুরস্ক, সাইপ্রাস ও ব্রুনেইয়ের বেশ কটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে সহায়তা দিয়ে থাকে।*

তাজুল ইসলাম